বর্ষ ২৫ | সংখ্যা ০৮ | আগস্ট ২০১৬

আলাপ এর ২৫ বছর

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় খাপ খাওয়ানোর নতুন উপায় খুঁজতে হবে।

পানিতে ভাসমান সবজি বাগান

হাঁস পালন

খাঁচায় মাছ চাষ

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৫: সংখ্যা ০৮
আগস্ট ২০১৬

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
কাজী মোহাম্মদ আবু হাসেম
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
মমতাজ খাতুন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

সূচিপত্র

- মূল রচনা : জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে ৩-৪
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর ভাবনায় সৃষ্টিতত্ত্ব ০৫
- গল্প : হারানো দিন ৬-৭
- এই গল্পের শেষ কোথায় : ছাগলের চালাকি ০৮
- সবার আগে দরকার সচেতনতা ০৯
- আমাদের কথা ১০-১১
- আমাদের লেখা ১২-১৩
- পরিবেশ ও জীব- বৈচিত্র্য রক্ষায় বাঁশখালীর ইকো ক্লাব ১৪-১৫
- ফেলনা জিনিস ফেলনা নয় ১৬

সম্পাদকীয়

বর্ষা মৌসুম চলছে। অনেকেই ভাবেন, বৃষ্টি কই! যত বৃষ্টি হওয়ার কথা তত বৃষ্টি নেই কেন? কয়েকবছর ধরে আমরা দেখছি গরমের দিনে গরম কম, শীতের দিনে শীত কম। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি কম। ব্যাপারটা কী? আসলে আকাশ, মাটি, পানি সবখানেই একটা পরিবর্তন। এটাকেই পন্ডিতরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের জন্য আমরা সবাই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। কিন্তু ক্ষতি নিয়েতো আর বসে থাকা যাবে না। কী করলে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, সেটা নিয়েও পন্ডিতরা গবেষণা করছেন।

এবারের আলাপের মূল রচনায়ও রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়। কী করে এই পরিবর্তন মোকাবেলা করা যায়। কী করে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলা যায়। এ বিষয়ে রচনার শিরোনাম 'জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে'। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, কালবৈশাখী, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত ইত্যাদি আমাদের প্রতি বছর ঝামেলায় ফেলে। কী কী উপায়ে ঝামেলাগুলো মোকাবেলা করা যাবে, এ সম্পর্কে এ রচনায় বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো একটি লেখা 'সবার আগে দরকার সচেতনতা'। আপনারা মনোযোগ দিয়ে লেখা দুটো পড়বেন। লেখার পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। এব্যাপারে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা আপনাদের সহযোগিতা করবেন।

আপনাদের জন্য আগের মতো এবারও একটি অসমাপ্ত গল্প দেয়া হয়েছে। নাম 'ছাগলের চালাকি'। গল্পটির বাকি অংশ আপনারা লিখে শেষ করবেন। তারপর পরবর্তী সংখ্যার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। যার লেখা ছাপানো হবে তিনি পাবেন পুরস্কার। এবারের সংখ্যাটি পড়ুন ও জানুন। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

ছবি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মসূচি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ইন্টারনেট।

মূল্য: ২০ টাকা

মূল রচনা

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে

অভয়াশ্রম

খাঁচায় মাছ চাষ

ভাসমান সবজি চাষ

বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ

পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য। বাড়ছে বিভিন্ন দুর্যোগ। যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, কালবৈশাখী, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত ইত্যাদি। ফলে বাড়ছে মানুষের দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি। আর এজন্য মানুষই দায়ী। মানুষ পরিবেশ দূষণ করছে। ফলে পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ুর।

বাংলাদেশের অবস্থা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সরাসরি দায়ী নয়। কিন্তু এর ফলাফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। কী ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে? আমরা জানি সমুদ্রের তলদেশের উচ্চতা একটু একটু করে বাড়ছে। এই উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ৫ ভাগের ১ ভাগ পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। (মতামত আইপিসিসি)। বিভিন্ন তথ্যে আরো আশংকার কথা শোনা যায়। যেমন, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকায় ৬ নম্বরে রয়েছে। এসব দুর্যোগ হলো- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা, ভূমিকম্প, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত ইত্যাদি।

১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ২০০শ' এর বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে। এসব দুর্যোগে ২ লাখেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে উপকূলের ১৯টি জেলার ৪ কোটি মানুষ। আমাদের চোখের সামনে দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের উচ্চতা বাড়ছে। নদী-নালা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির ধূঁয়া ও কারখানার বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট করছে আমাদের প্রকৃতি। পরিকল্পনা ছাড়া যেখানে সেখানে দালান কোঠা তৈরি হচ্ছে। এসব কারণে জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, পাহাড় ও ভবন ধ্বংসের আশংকা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী ২০ বছরে বাংলাদেশে দূর্যোগ বাড়বে ৩২০ ভাগ।

পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে চলা

জলবায়ু পরিবর্তন ক্ষতিগ্রস্থ করছে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে। এর প্রভাব পড়ছে কৃষি, মৎস্য চাষ, স্বাস্থ্য ও পানি সম্পদে। এ

অবস্থায় বসে থাকলে চলবে না। পরিস্থিতির সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এটাকে বলে অভিযোজন করে চলা।

এই অভিযোজন কীভাবে করতে হবে? এটি এক দিনের বিষয় নয়। ধারাবাহিকভাবে এ কাজটি করতে হবে। পরিস্থিতিকে বুঝতে হবে। কেন সমস্যা হচ্ছে! কারা করছে! এগুলো জানতে হবে। তারপর সমস্যা সমাধানের উপায় বের করতে হবে। বাঁচার নতুন নতুন পথ বের করতে হবে। নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

কী কী ক্ষেত্রে অভিযোজন করা যায়

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী নানারকম কাজের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। যেমন- নদীভাঙন ও চর এলাকায় তরমুজ, বাংগি ও মিষ্টি কুমড়া চাষ।

বন্যা প্রবণ এলাকায় খাঁচায় মাছ চাষ। নদী ভাঙন এলাকায় বাড়ি ঘর হারানো মানুষের জন্য গুচ্ছ গ্রাম তৈরি। কচুরিপানা একত্র করে পচিয়ে ভাসমান বেড তৈরি। যাতে সবজি, হলুদ, আদা ও ধান চাষ করা যায়। উঁচু ভিটায় কিল্লা তৈরি। যাতে বন্যার সময় মানুষ ও পশুপাখি আশ্রয় নিতে পারে।

খরা প্রবণ এলাকায় মিনি পুকুর তৈরি। যার সাহায্যে সেঁচ দিয়ে আমন ধান চাষ করা। এছাড়া বসত ভিটায় সবজি বাগান, আমন-ছোলার শস্য বিন্যাস, রোপা আপনের জন্য শুকনা বীজতলা তৈরি। উন্নত চুলার ব্যবহার ইত্যাদি।

এসব কাজের পাশাপাশি আরো যা করা যায়-

- হঠাৎ বন্যা থেকে ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ তৈরি।
- স্বল্প মেয়াদী আগাম ধানের উৎপাদন বাড়ানো।
- আড়-বাঁধের মাধ্যমে ভিটামাটি ও ফসল রক্ষার ব্যবস্থা।
- হঠাৎ বন্যা থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য হিজল, করচ ও বরুন গাছের বাগান করা।
- খাল পুনঃ খনন করা।
- ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও লবণাক্ত এলাকায় হাঁস পালনের উদ্যোগ নেয়া।
- নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা।
- ভাসমান বাগান করা। রিংভিত্তিক ঝুলন্ত বাগান করা, শস্যগোলা স্থাপন ও বৃষ্টির পানি ধরে রাখা।

এভাবে নতুন নতুন ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর একাজ কোনো একজন মানুষের কাজ নয়। সমাজের সবাইকে এজন্য এগিয়ে আসতে হবে। সরকার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে জলবায়ু পরিবর্তন কোনো একজনের বিপদ ডেকে আনে না। তা প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীকূলের বিপদের কারণ।

ধান মাড়াইয়ে টেকসই প্রযুক্তি

বাড়ির ভিটা উঁচুকরণ

মেলে বা পাটি পাতা চাষ

উন্নত জাতের ধানের বীজতলা

মূল রচনা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, টিমলিডার, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন সেন্টার।
সহজীকরণ: মোহাম্মদ মহসীন, সহকারী পরিচালক, টিএমডি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর ভাবনায় সৃষ্টিতত্ত্ব

আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের কাজকর্ম দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের কাজকর্ম এক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা চির দিনের, চির কালের। ইহকাল ও পরকালকে ঘিরে তাঁদের কাজকর্ম। হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন এমনই একজন মহাপুরুষ। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বকালের জন্য। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নিজ ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। মাতৃভাষায় সেই সম্মিলিত শিক্ষাকে তিনি বাঙালি মুসলমানের দিক নির্দেশনা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) জানতেন সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্রষ্টার প্রেম। তাই তিনি সৃষ্টির অপার রহস্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেমময় সম্পর্ক আমাদের জানতে বলেছেন। সৃষ্টির গুঢ় অর্থ এবং মানব সমাজের করণীয় সম্পর্কে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি তার 'কোরআনের শিক্ষা' বইয়ে বলেছেন, 'বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের কোনো বিরোধ নেই। বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম আবিস্কার করে।' তিনি তার 'সৃষ্টিতত্ত্ব' বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন, 'প্রেমময়ের প্রেম সমুদ্র হইতে উদ্ভুত ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল।' তিনি একই বইয়ে বলেছেন, 'এক সময়ে কোন বস্তু ছিল না, ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে।'

গ্লোবের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান কীভাবে চিহ্নিত করা যায়। জল স্থল সম্পর্কে কীভাবে ধারণা পাওয়া যায়। তা জানিয়েছেন আমাদের। ম্যাপ কি কাজে প্রয়োজন? তাও আমাদের জানানোর চেষ্টা করেছেন। এমনকি সামাজিক মানচিত্রে একটি গ্রামের নকশা অংকিত করে গ্রাম উন্নয়নের ধারণাও দিয়েছেন। 'বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান' বইয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেছেন। এসব ধারণা নিয়ে আমরা আমাদের গ্রামের উন্নয়ন করতে পারি। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। এ সময় গ্রাম উন্নয়নের বিষয়টি ভাবা দরকার। বিষয়টি মানুষের জীবন জীবিকার সাথেও জড়িত। যার উপর ভিত্তি করে আহ্ছানিয়া মিশন তৈরি করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট।

আমরা মানুষরাই প্রকৃতিকে করছি ধ্বংস। যার ফলে বাড়ছে তাপমাত্রা। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। ধীরে ধীরে বসবাসের যোগ্যতা হারাচ্ছে পৃথিবী। আমরা যদি স্রষ্টার নির্দেশ মানতাম। তার নির্দেশ মতো সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করতাম। তাহলে পৃথিবীর এ অবস্থা হতো না। পৃথিবী হতো ভবিষ্যত মানুষের স্বপ্নের আবাস। এ কারণে সৃষ্টির সেবা করা প্রয়োজন। হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সমগ্র মানব জাতির প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন।

লুৎফুন নাহার তিথি
উপকরণ উন্নয়নবিদ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ।

গল্প

হারানো দিন

শফিক আহমেদ প্রায় চল্লিশ বছর পর নিজ গ্রামে ফিরছেন! কত কথা মনে পড়ছে। কত স্মৃতি! আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন তার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর।

সেই বয়সে তাকে নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমান তার মা বাবা। আসেন লন্ডনে। এরপর আত্মীয় স্বজনেরা অনেকে বিদেশে চলে যান। তার আর আসা হয় না দেশে। আজ এত বছর পর একটি গবেষণা কাজে ঢাকা এসেছেন তিনি। কাজ শেষে আসছেন নিজ গ্রামে। গাড়ি চলছে, গাড়ির দুলুনিতে তার দুচোখ লেগে আসে। গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তিনি চলে যান চল্লিশ বছর আগের ফেলা আসা তার গ্রামে। গ্রামের পাশে নদী। নাম তার মরা কুশিয়ারা। টলমলে তার জল।

বর্ষাকালে এই এলাকার নদীনালা ও ফসলের জমি পানিতে ডুবে যায়। মনে হয় যেন সাগর। সেই সময়ের এক ছুটির দিনের ঘটনা। ছেলেবেলার বন্ধু মান্নান চিৎকার করে বলে, 'শফিক তাড়াতাড়ি চল। আমাদের হাঁস দুটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' দৌড়ে যায় ওরা বাড়ির পিছনে হাওড়ে। গিয়ে দেখে কিছু কচুরিপানার উপর হাঁস দুটো বসে আছে। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানা। সেই সাথে হাঁস দুটি। মান্নান ডানপিটে ছেলে। বলে, 'পারবি না শফিক সাঁতার দিতে?' শফিক বলে, 'পারব না মানে? খুব পারব।' দুই বন্ধু ঝাঁপ দেয় নদীতে। তারপর সাঁতার আর সাঁতার। সেই কচুরিপানার মধ্য থেকে দুই বন্ধু হাঁস দুটি উদ্ধার করে। পাড়ের লোকজন হাততালি দিয়ে ওঠে।

'স্যার ও স্যার! উঠবেন না। আইসা পড়ছি।' গাড়ির হেলপারের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে যায় শফিকের। চোখ মেলে তাকায়। হেলপার ছেলেটা আবারও বলে, 'আইসা পড়ছি স্যার। নামেন স্যার।' 'ও আচ্ছা' বলে নেমে পড়েন শফিক। তারপর হাঁটতে থাকেন।

হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে তাকান তিনি। কোথায় সেই চোখ জুড়ানো খোলা মাঠ! চারদিকে ঘিঞ্জি বাড়ি ঘর। রাস্তার ধারে এক জায়গায় কয়েকটি শিশু লাটিম খেলছে। তার চোখ আটকে যায় লাটিমের দিকে। লাটিমটা প্লাস্টিকের তৈরি! আবার তিনি ছেলেবেলায় ফিরে যান। ছেলেবেলার বন্ধু মান্নান, কলিম, সুনীল সবাই ছুট ছুট। কোথায়? হাওরের পানিতে ভেসে আসছে লাটিম ফল। ওরা বলে লাটিম গোটা। সেই গোটা নিয়ে তার বোটা কাটে। তারপর কাঠি ঢুকিয়ে তৈরি করে লাটিম। আজ কত বছর পরে সেই আনন্দে নিজের মনে হেসে ওঠেন শফিক সাহেব। আর ঠিক সে সময় পাশ থেকে কে যেন চিৎকার করে ডাকে, 'শফিক! শফিক!' লোকটি সামনে এসে দাঁড়ায়। 'শফিক চিনতে পারো? আমি মান্নান!'

চমকে তাকায় শফিক। চেনা যায় না কিছুতেই। শুধু মায়া ভরা সেই চোখ দুটো দেখে চিনতে পারে ছেলেবেলার বন্ধু মান্নানকে। দুই বন্ধু জড়িয়ে ধরে দুজনকে।

শফিক মান্নানকে নদীর ধারে নিয়ে যেতে বলেন। আহা কতদিন নৌকা বাইচ দেখা হয়

না! কিন্তু মান্নান তাকে নিয়ে যেতে রাজি হয় না। আপত্তি করেন। বলেন, 'না না এখন বাসায় চলো বন্ধু। এখনই সন্ধ্যা নামবে। কাল সকালে নিয়ে যাব।' কিন্তু শফিক বলেন, 'আমার মন অশান্ত হয়েছে। আমাকে এখনই নিয়ে চল।' মান্নান আর কথা বলেন না। মাটির দিকে তাকিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে নানা কথা হয় তাদের মধ্যে। একটি কাটা গাছের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন মান্নান। বলেন- 'নদী দেখবে না? দেখো ভালো করে। এই তোমার নদী।' চমকে ওঠেন

শফিক মান্নানের কথা শুনে।

নদী কোথায়! সামনে ঘন বসতি। ঠাসাঠাসি ঘরবাড়ি। শফিক রাগ করে বলেন, 'তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ মান্নান?'

কঠিন স্বরে মান্নান বলেন, 'এতোদিন কোনো খোঁজ রাখনি শফিক! বিদেশে গিয়ে শুধু টাকাই কামিয়েছো। ভালো-মন্দ কোনো খোঁজ রাখনি নিজ গ্রামের।' মাথা নিচু করে শফিক। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তবুও প্রশ্ন করেন, 'কীভাবে হলো এমন?'

মান্নান বলেন, 'এই চল্লিশ বছর ধরে নদী শুকিয়ে চর পড়েছে। মানুষ বেড়েছে। চর দখল হয়েছে। নদী ভরাট হয়েছে কিন্তু কোনো ড্রেজিং হয়নি।' শফিকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হারানো দিনের স্মৃতি। বৈশাখ মাসে ধান কাটতে আসত ভিন জেলার নৌকা। প্রতি সন্ধ্যায় কুপি জ্বালিয়ে নৌকায় বসত পুঁথি পাঠের আসর। কতরকম পুঁথি। মধুর সুরে পাঠ করত সোনাভানের কিচ্ছা, আমীর সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী, দেওয়ানা মদিনা। নৌকা বাইচ হতো নদীতে। কী আনন্দে কাটত তাদের সেসব দিন।

এই চল্লিশ বছরে সব হারিয়ে গেছে। নদী মরে গেছে! সেই মেলা, সেই নৌকা বাইচ, আর সেই পুঁথি পাঠের আসর আজ শুধুই স্মৃতি!

শফিক আহমেদ তাকিয়ে থাকেন সামনে। যেখানে ছিল নদীটি। এখানে হারিয়ে গেছে তার ছেলেবেলার দিন। হারিয়ে গেছে নদী।

মোঃ জাহিদুর রহমান খান
ঊর্ধ্বতন উপকরণ উন্নয়নবিদ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

ছাগলের চালাকি

একদিন এক বাচ্চা ছাগল মায়ের কাছে থেকে হারিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছে সে। কাছেই ছিল বড় বন। একটু পর চারদিক সন্ধ্যা নেমে আসল। অন্ধকারে বনের মধ্যে হাঁটা ধরল সে। হঠাৎ ধরা পড়ল সে এক নেকড়ের হাতে। নেকড়েটা ছিল খুবই ক্ষুধার্ত। সে তো ছাগলকে পেয়ে মহা খুশি। পারলে তখনই গপ গপ করে খায়।

ভাবখানা বুঝেই ছোট্ট ছাগল কেঁদে ফেলল। বলল, 'না না নেকড়ে মামা, আমায় খেয়ো না। আমি আর কতটুকুন? এটুকু মাত্র। খেয়ে তোমার পেট ভরবে না। তারচেয়ে আমায় ছেড়ে দাও। আমি তোমায় নিয়ে যাব এমন এক জায়গায়, যেখানে অনেক খাবার আছে। বড় বড় মোটা সোটা সব প্রাণী। তাদের ধরলে তোমার পেটও ভরবে, আমারও জান বাঁচবে।'

শুনে নেকড়ে তো মহা খুশি। সে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আচ্ছা যা তোর কথা মেনে নিলাম। যদি বড় কোনো প্রাণী দেখাতে না পারিস, তাহলে তোকে আগে একটা জোরে আছাড় দিব। এরপর কষ্ট দিয়ে একটু একটু করে খাব।'

এই বলে ছাগলের দেখানো পথে দু'জনে অন্ধকারে পথ চলতে লাগল। একটু পরই ছাগলের চটাস চটাস ঠোঁট চাটার শব্দ কানে আসল। শুনে নেকড়ে বুঝল ছাগল কী যেন খাচ্ছে। নেকড়ে শুধায়, 'কি খাচ্ছিস রে তুই?' ছাগল বলল, 'বাদ দাও নেকড়ে মামা। ওটি তোমার কাজ নয়। তোমার সাহসে কুলাবে না।' শুনেই গর্জে উঠল নেকড়ে। কী এত বড় কথা! এতটুকু ছাগলের এত সাহস! 'বলেই দেখ পুঁচকে। পারি কিনা করে দেখাচ্ছি আমি। আমার চেয়ে তোর কি বেশি সাহস?'

ছাগল কোনো কথা বলে না। সে শব্দ করতে থাকে। আর মনে মনে পালাবার জন্য উপায় খুঁজতে থাকে।

গল্পের বাকি অংশ নিয়ে ভাবুন। তারপর পরবর্তী সংখ্যার জন্য লিখে পাঠান।

লুৎফুন নাহার তিথি
উপকরণ উন্নয়নবিদ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ।

সবার আগে দরকার সচেতনতা

কালো ধোঁয়ায় ভারী হচ্ছে আকাশ-বাতাস

নির্বিচারে কাটা হচ্ছে গাছ। নদীতে বাঁশ পুঁতে কারেন্ট জাল দিয়ে ধরা হচ্ছে ডিমসহ ছোট-বড় মাছ। আইনি সহায়তা নিয়েও রক্ষা করা যাচ্ছে না দেশের জীব বৈচিত্র্য। কৃষি জমির টপসয়েল যাচ্ছে ফসলি ক্ষেতে গড়ে ওঠা ইটের ভাটায়। টপসয়েল হলো মাটির উপরের স্তর। এছাড়া জ্বলছে কাঠ। এই কালো ধোঁয়ায় ভারী হচ্ছে আকাশ-বাতাস। বিষটোপ কিংবা কৌশলী ফাঁদ পেতে ধরা হচ্ছে দেশি কিংবা পরিযায়ী পাখি। বেহিসেবি হওয়ার কারণে দিন দিন নেমে যাচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর।

অনাবাদি হয়ে পড়ছে সোনাফলা বাংলার মাটি। প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে যেন মেতে উঠেছে মানুষ।

গাছ কাটা হচ্ছে অবাধে

জমিতে দেয়া হচ্ছে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার

হয়ে পড়ছে সোনা ফলার বাংলার মাটি। প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে যেন মেতে উঠেছে মানুষ। আর এ সবকিছুই হচ্ছে মূলত অসচেতনতার কারণে। একজন মানুষ যদি বুঝতে পারত যে অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণীই বাঁচে না। আর সেই অক্সিজেন দেয় গাছ, তাহলে সে কি গাছ কাটতে পারত! আমরা যদি বুঝতে পারতাম নদীর প্রয়োজনীয়তা। যত্রতত্র ইটভাটার ক্ষতিকর দিক। গাছ কাটার কুফল জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করার পরিণাম কী হতে পারে? তাহলে আমরা কখনোই এই সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠতাম না।

পানির বেহিসেবি খরচে আগামী দিনগুলোতে সুপেয় পানির অভাব দেখা দেবে। এটা যদি আমরা বুঝতাম, তাহলে অবশ্য আমরা পানি খরচে বেহিসেবি হতাম না। কীটনাশক আর রাসায়নিক সার ব্যবহার হচ্ছে। এজন্য মানুষের নানাবিধ জটিল ও কঠিন রোগ হচ্ছে। পাশাপাশি মাটির উর্বরাশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এটা যদি কেউ বুঝত তাহলে অধিকাংশ মানুষ অবশ্যই জমিতে ব্যবহার করত জৈবসার।

আর তাই সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে কী করলে কী হয়? এই বোঝানোর দায়িত্ব কে নেবে? সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান? নাকি দায়িত্ব নেবে সচেতন নাগরিক? আমি বলব এ দায়িত্ব আমাদের সবাইকেই নিতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে আসতে হবে।

লেখা ও ছবি: মুকিত মজুমদার বাবু।
'আমার দেশ ও আমার প্রকৃতি' বই থেকে লেখাটি সংগৃহীত।

আমাদের সমস্যা সমাধান করব আমরাই

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমাকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরপর মিশনের তত্ত্বাবধানে আমরা কাজ শুরু করি। আমরা বুঝেছি, শুধু দাতাদের উপর নির্ভর করলে চলবে না। তারা আজ আছে কাল নেই। সমস্যা আমাদের। আমাদেরই সমাধান করতে হবে। তাই আমরা শুধু দাতাদের সাহায্যের অপেক্ষায় বসে নেই। নিজেরাই টাকা সংগ্রহ করছি এখন। এজন্য বিভিন্ন সংস্থাকেও একাজে যুক্ত করেছি আমরা। এলাকার ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করেছি। আমরা নিজেরাই ব্যানার তৈরি করি। র‍্যালি করি। মহড়া দিই। জরুরি সেবা প্রদান করি। গাছ লাগাই। নিজ উদ্যোগে একটি দুর্যোগ তথ্যকেন্দ্র ও একটি লাইব্রেরি তৈরি করেছি। বিভিন্ন মেলায় আমরা স্টল দিই। যেন মানুষ সচেতন হয়। দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এ এন আলিম আহাম্মেদ, সভাপতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৩নং ওয়ার্ড, মিরপুর।

গাছ লাগানোর পরামর্শ দেই

আমি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্পের সদস্য। পরিবেশ ক্লাবের সদস্য হওয়ার পর বাড়ির আশেপাশে গাছের চারা রোপণ করেছি। সেগুলো যত্ন করি। অন্যদেরও গাছ লাগানোর পরামর্শ দিচ্ছি।

কাসপ্রিয়া তাবাস্ছুম, সপ্তম শ্রেণি, সাধনপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁশখালী।

বাড়িওয়ালারা সচেতন নয়

দীর্ঘদিন এই এলাকায় বাস করছি। মিশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনেক প্রশিক্ষণ পেয়েছি। দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে কী করা উচিত এখন আমরা তা জানি। আমরা মানুষকে সচেতন করতে পথ নাটকের ব্যবস্থা করি মাঝে মাঝে। স্কুলের ছাত্ররা এই নাটক করে থাকে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে ছাত্রদের এই প্রশিক্ষণ দিয়েছে। কিন্তু এলাকার বাড়িওয়ালারা সচেতন নয়। বিল্ডিং কোড মানা হচ্ছে না। এ বিষয়ক আইন থাকলেও তার প্রয়োগ নেই। তাই বাড়ির মালিকদের কোনো শাস্তি হচ্ছে না। তাদেরও সচেতনতার প্রয়োজন আছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম চুন্নু, সহ-সভাপতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৩নং ওয়ার্ড, মিরপুর।

বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি

প্রতিটি বিদ্যালয়েই নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে কী করা উচিত তা জানাতে হবে। বেশি বেশি করে দুর্যোগ মোকাবেলা মহড়া দিতে হবে। পাশাপাশি দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে আরো কিছু যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।

রিনা রাণী মন্ডল, ওয়ার্ড সুপারভাইজার, ডিপিকো-৮, মিরপুর-২

দুর্যোগ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ তৈরি করতে হবে

আমাদের দুর্যোগ বিষয়ক পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ নেই। তাই চাইলেও অনেক কিছু সহজে বোঝাতে পারি না। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি দুর্যোগ বিষয়ক আরো শিক্ষা উপকরণ দরকার। তাহলে শিখন সহজ হবে। ফ্লিপচার্ট, লিফলেট হাতে পেলে আলোচনা করতে সুবিধা হয়। তাই পাজল, পাইচার্ট, চার্ট, লুডু বেশি করে তৈরি করা যেতে পারে। তাছাড়া জরুরি ফোন নাম্বারগুলো দিয়ে একটি লিফলেট তৈরি করে বিতরণ করা যেতে পারে। যেমন- হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ স্টেশন, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি।

স্কুল সেফটি প্ল্যান অনুসারে বছরে ৩ টি মহড়া হয়। এই দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া বা মগড্রিল আরো বাড়াতে হবে। এটি প্রতিমাসেই একবার করে হওয়া দরকার।

মোঃ শহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষা নিকেতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ওয়ার্ড ২, মিরপুর।

আরো উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন

প্রকল্প আসে, প্রকল্প চলে যায়। প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি দিয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এ বিষয়ক নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই সাথে ফায়ার সার্ভিসও ঢেলে সাজাতে হবে। সেখানেও আরো উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। লোকবল বাড়াতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শুধুমাত্র দুর্যোগ নিয়েই কাজ করবে এমন দল ও সংগঠন তৈরি করতে হবে।

এ,এস, এম নজরুল ইসলাম, প্রজেক্ট অফিসার, ডিপিকো-৮, মিরপুর ও সাভার।

জলবায়ু পরিবর্তনের খারাপ দিক সম্পর্কে জেনেছি

আমি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্পের পরিবেশ ক্লাবের সদস্য। এখান থেকে আমি জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন খারাপ দিক সম্পর্কে জেনেছি। প্রতিরোধের কিছু কিছু কৌশল সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যা অনেক উপকারে আসবে।

মুন্নি আকতার, নবম শ্রেণি, নাসেরা খাতুন আর. কে উচ্চ বিদ্যালয়, বাঁশখালী।

নতুন আলোয় সাজাই সমাজ

সব মানুষের শক্তি দিয়ে
আলোয় ভুবন ভরা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিয়েও
দেশটা যাবে গড়া।

চল সবাই যাই এগিয়ে
ওদের কাছাকাছি
গিয়ে বলি, বন্ধু আমার
এইতো পাশে আছি।

বন্যা আসুক, বিপদ আসুক
আসুক ঝড়ের ভয়
সব বাধাকে দূর করে দেই
ওরাও করুক জয়।

তারাও যেন বুঝতে পারে
ঝড়ের পূর্বাভাস
আশ্রয়কেন্দ্রে দিতে হবে
শান্তি সুখের বাস।

আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পথে
না যেন রয় কাদা
হুইল চেয়ার ঠেললে পরে
পায় না যেন বাধা।

টয়লেট আর টিউবওয়েল
এমন হওয়া চাই
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য
কোনো দুর্ভোগ নাই।

ত্রাণ প্রদানে দিতে হবে
অগ্রাধিকার ওকে
ভালোবাসার মায়া থাকুক
সব মানুষের চোখে।

ওরাও হাসুক, ওরাও বাঁচুক
রাখবো না আঁধার
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পাক
সমান অধিকার।

মোঃ লিটন
ভলেন্টিয়ার, ডিপিকো-৮ প্রকল্প, মিরপুর।

শান্ত থাকি নিজকে নিরাপদ রাখি

যখন তখন হঠাৎ করে
কেঁপে উঠবে মাটি
কাঁপবে দালান ঝন-ঝনাবে
ঘরের থালাবাটি।

শান্ত থাকা খুব জরুরি
কাঁপবে যখন মাটি
ভেবে চিন্তে করবে কাজ
নয়কো ছুটোছুটি।

লিফটে চড়ে করবে না কেউ
নিচে নামার চেষ্টা
যতই কাঁপুক খাট পালঙ্ক
কাঁপুক সারা দেশটা।

এমন সময় থাকলে শুয়ে
নিজের বিছানাতে
বালিশ দিয়ে মাথা বাঁচাও
ভারি কিছু হতে।

বড় কিংবা শক্ত টেবিল
শোবার খাটের নিচে
সাথে সাথে আশ্রয় নাও
যেটাই পাবো কাছে।

ভূমিকম্পে রান্না ঘরটা
অনেক বেশি ঝুঁকি
অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে
সাবধানেতে থাকি।

ভূমিকম্পের স্থায়ীত্বকাল
যদিও খুবই অল্প
প্রস্তুতি ও সাবধানতার
নাই কোনো বিকল্প।

পতাকা দেখি সজাগ থাকি

লাল-কালোর এক পতাকা
উড়ছে শান্ত গাঁয়
দূর সাগরে ওই ঘূর্ণিঝড়
আসছে তেড়ে হায়।

ঐ যে দেখো ঘূর্ণি বাতাস
সাগর থেকে তেড়ে
গাঁয়ের দিকে আসছে বিপদ
দুই পতাকা ওড়ে।

বিপদ থেকে মহাবিপদ
আসতে পারে দ্রুত
সবাই মিলে প্রস্তুতি নেই
কেউ হবো না ভীত।

দেখবে যখন তিন পতাকা
সামনে মহা বিপদ
ঘূর্ণি দিয়ে চূর্ণ করার
আসছে সেই আপদ।

মহাবিপদ আসার আগেই
এই বার্তা মানব
প্রতিবেশী স্বজন সবাই
আশ্রয়কেন্দ্রে থাকব।

রীনা রাণী মন্ডল
ওয়ার্ড সুপারভাইজার, ডিপিকো-৮ প্রকল্প, মিরপুর।

পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় বাঁশখালীর ইকো ক্লাব

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পের ইকো ক্লাবের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছ বিতরণ করা হচ্ছে

পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নানা জায়গায় কাজ করছে। তার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা। এখানে রয়েছে বন বিভাগের দুটি বিট এলাকা। নাম- সাধনপুর ও কালিপুর বিট। এই বিট এলাকায় যৌথ ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়িত হচ্ছে "জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্প"। সহায়তা করছে 'আরণ্যক ফাউন্ডেশন'। এজন্য বন নির্ভরশীল ১০৩০ পরিবার থেকে ৩৫ টি দল, ২টি ফেডারেশন ও ৬টি ইকো ক্লাব গঠন করা হয়েছে। যাদের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্থানীয় মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ৬টি ইকো ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ইকো ক্লাব মানে পরিবেশ রক্ষা ক্লাব। প্রতিটি ক্লাবে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। ইকো ক্লাব পরিবেশ রক্ষায় নানারকম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন- বৃক্ষরোপণে সবাইকে উৎসাহিত করা। বন ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় জনগণকে সচেতন করা। পাখির আবাসস্থল তৈরির জন্য গাছে হাঁড়ি বাঁধা। এ কাজে অর্থ সংগ্রহের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ৬ টি অক্সিজেন বক্স। অক্সিজেন বক্স মানে তহবিল সংগ্রহের জন্য দান বাক্স। এই দান বাক্সে সবাই সাধ্য অনুযায়ী টাকা পয়সা দান করেন। যেমন- ছাত্র, শিক্ষক, এসএমসির সদস্য ও স্থানীয় জনগণ।

একজন মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে প্রতিদিন গড়ে ৫৫০ লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে। এই

অক্সিজেন আমরা পাই গাছ থেকে। কিন্তু এর জন্য কোনো টাকা পরিশোধ করতে হয় না। একটি সুস্থ ও পূর্ণ বয়স্ক গাছ ১০ জন মানুষের অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাই আমাদের বাঁচার জন্য দরকার প্রচুর গাছ ও বনভূমি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ অনেক কম।

এই সমস্যা দূর করার জন্য ইকো ক্লাবের সদস্যরা কাজ করছে। অক্সিজেন বক্স স্থাপনের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেছে। এই তহবিল দিয়ে বিভিন্ন স্থানে বছরে দুইবার বৃক্ষরোপণ করা হয়। যেমন- স্কুলের আঙিনা, ছাত্র-ছাত্রীদের বসতভিটা এবং পাহাড়ের বিরান বনভূমি। এছাড়া বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে পরিবেশ বিষয়ক রচনা লেখা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাখির বংশবৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য গাছে হাঁড়ি বাঁধা হয়। ফেলে দেয়া পানির বোতল দিয়ে দেয়াল-উদ্যান তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়।

ইতোমধ্যে ইকো ক্লাবের সদস্যরা বাড়ির আঙিনা ও পাহাড়ের বিরান ভূমিতে ২৫০০টি গাছের চারা রোপণ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা। ইকো ক্লাবের উদ্যোগে ২৭৫ টি গাছে হাঁড়ি বাঁধা হয়েছে। ফলে পাখিরা সহজেই তাদের আবাসস্থল গড়তে পারছে। যা পাখির বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এখন এই এলাকায় সারাদিন শোনা যায় পাখির কল-কাকলি।

স্কুলভিত্তিক এই নতুন উদ্যোগ স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এ কাজটি আমরা নিজেদের এলাকায় করার জন্য উদ্যোগ নিতে পারি।

আব্দুর রাকিব
কর্মসূচি সমন্বয়কারী, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

ইকো ক্লাবের একজন স্কুল শিক্ষার্থী গাছ গ্রহণ করছে

ফেলে দেয়া জিনিস ব্যবহার করি

ছবি ইন্টারনেট

উপরের ছবিগুলো দেখুন। ছবিতে ফেলে দেয়া জিনিসগুলোকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- ডিমের খোসা, পানির বোতল ইত্যাদি। এভাবে ফেলে দেয়া জিনিস ব্যবহার করে পরিবেশও রক্ষা করা যায়। এই ছবিগুলো তারই উদাহরণ। আমাদের চারপাশে এরকম অনেক ছড়ানো ছিটানো জিনিস পড়ে থাকে। বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা এসব জিনিস নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি।

আলাপ পত্রিকা নিয়মিতভাবে ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission